গোপাল হালদারের স্মৃতি

অনিমেষকান্তি পাল

গোপাল হালদার মশায়ের সঙ্গে ব্যক্তিগত ভাবে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছি অনেক পরে। কলেজে স্নাতক শ্রেণীতে পড়বার সময়ে তাঁর লেখা বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা পড়তে ভালো লাগত। আলোচনা সংক্ষিপ্ত কিন্তু বুদ্ধিদীপ্ত এবং তার সঙ্গে লেখকের নিজের মন্তব্যে ভালোলাগার ছোঁয়া। ঠিক পাঠ্য বইয়ের মতো নয় কিন্তু পাঠ্যবিষয়ে সবই আছে।
স্নাতক স্তরে পৌঁছানোরও আগে, তাঁর আর একখানা বইয়ের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছিলাম। বইটির নাম - সংস্কৃতির রূপান্তর। তখন ছবি আঁকতে ভালবাসতুম। তবে ছবি আঁকা সম্বন্ধে বিশেষ কোন উচ্চাশা ছিল না। দেশ - ভাগের আগে খুলনা শহরে থাকতেন কেশব ভৌমিক নামে এক চিত্রশিল্পী। তাঁর কাছে ছবি আঁকতে যেতুম। পরে উনি যখন কলকাতায় চলে এলেন তখনো আগের মতই ওঁর কাছে যাতায়াত করতুম। ছবিআঁকার ব্যাপারটা বেশিদূর এগোয়নি। কিন্তু তাঁর কাছে প্রগতিশীল, বামপন্থী লেখকদের অনেক বই, পত্র - পত্রিকা পড়তে পেতুম। সেইখানেই পেয়েছিলুম -- সংস্কৃতির রূপান্তর । তখন বইটি পড়ে মুগ্ধ এবং অবাক হয়েছি।
গোপাল হালদারকে চোখে দেখার আগেই এভাবে তাঁর লেখার সঙ্গে পরিচয় হয়ে গেল। স্নাতক স্তরে রাজনীতির সঙ্গেই যোগ বেশি ছিল। কলেজী পড়াশোনার দিকে খুব একটা টান ছিল না। কিন্তু তখন হাতের কাছেযা পেতাম তাই গোগ্রাসে গিলতাম। সব যে হজম করতে পারতাম তা নয়। বাবার নতুন উপন্যাস কেনার ঝোঁকছিল। হাতে কিছু পয়সা কড়ি এসে গেলে তিনি একসঙ্গে অনেক উপন্যাস কিনতেন। এইভাবে আমাদের বাড়িতে এসে পড়েছিলগোপাল হালদারের সাড়া জাগানো উপন্যাস -- একদা, অন্যদিন আর একদিন। পরে ত্রিদিবা নামে এক সঙ্গে এই তিন বইয়ের নতুন সংস্করণ হয়েছে।
ঐ তিনটি উপন্যাস অবশ্য একবারে বসে একসঙ্গে পড়া হয় নি। বাদ দিয়ে দিয়ে, অনেকদিন পরে পরে একটু একটু করে পড়েছি। এই তিন উপন্যাস পড়া মানে পুরোপুরি একটি বিশিষ্ট পাঠক্রম অনুসরণ করা। আজকের দিন থেকে কতদূর সেইসব দিনের স্মৃতি প্রথমত আমার নিজের পড়ার স্মৃতি আর দ্বিতীয়ত উপন্যাসে ধৃত দিনগুলির স্মৃতি। কেবল যে ব্রিটিশ সরকারের জেলে ছিলেন তাতো নয়, কংগ্রেস সরকারের জেলেও গোপাল হালদার মশাইকেথাকতে হয়েছিল বহুদিন।
মহা দুর্ভিক্ষের পটভূমিকায় তারাশঙ্কর লিখেছিলেন এক উপন্যাস। মহা দুভিক্ষের বছরটি ছিল বাংলা তেরশো। তাই এই দুর্ভিক্ষকে বলা হয় পঞ্চাশের মন্বন্তর। আরেক মন্বন্তর আছে ইংরেজ রাজত্বের গোড়ায়। ছিয়াত্তরের মন্বন্তর। বঙ্কিমের আনন্দমঠে ঐ মহাদুর্ভিক্ষের মর্মস্পর্শী বিবরণ পাওয়া যায়। গোপাল হালদার মশাইও পঞ্চাশের মন্বন্তরের পটভূমিকায় লিখেছিলেন এক উপন্যাস। তারাশঙ্করের উপন্যাসটির নাম মন্বন্তর (১৯৪৪)। আর গোপাল হালদারের উপন্যাসটির নাম -- তেরশ পঞ্চাশ (১৯৪৫)। এই দুই উপন্যাসও আমাদের বাড়িতে এসেছিল আর এই দুটি উপন্যাস পাশাপাশি পড়ার অভিজ্ঞতা যাদের হয়েছে তাঁরা জানেন যে তারাশঙ্করের দৃষ্টিকোণ যতটা বাস্তবভিত্তিকগোপাল হালদার মশায়ের দৃষ্টিকোণ ততটাই রাজনৈতিক।
১৯৫৩ সালে কমিউনিস্টপার্টি পথ পরিবর্তন করল। গোপাল হালদার প্রমুখ পার্টির বুদ্ধিজীবীরা আবার খোলামেলা কাজকর্ম শু করলেন। এই সময় গোপাল হালদার মশাই নানা সভা সমিতিতে বক্তৃতা দিতেন। তবে তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল চাপা এবং ভাঙা ভাঙা। বামপন্থী বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে তিনি তখন একজন শীর্ষস্থানীয় নেতা,পরিচয় পত্রিকার অন্যতম পরিচালক।

তিনি বাগ্মী ছিলেন, ওজস্বী ভাষায় বক্তৃতা করতেন। বাংলা ভাষা আন্দোলনে লেজিস্‌লেটিভ কাউন্সিলে এবং বাইরে তিনি অনেক স্মরণীয় বক্তৃতা দিয়েছিলেন। তো, এইভাবে তাঁর কথা শোনা এবং দূর থেকে তাঁকে দেখার সুযোগ হল। বি. এ. পাশ করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে গেলুম। তখনো মন রাজনীতিতে যতটা মগ্ন লেখাপড়ায় ততটা নয়। কিন্তু লেখালখির দিকে কিছুটা ঝুঁকেছি। বামপন্থী পত্র - পত্রিকায় দু-একটা লেখাছাপা হচ্ছে।

।। দুই ।।

সেটা হল ঊনিশশো পঞ্চান্ন সালের কথা। তখন আমার বন্ধুদের কারো কারো লেখা ছাপা হচ্ছে পরিচয় পত্রিকায়। তখনকার দিনে আমাদের কাছে ওটা বিরল সম্মান বলে মনে হত। মাঝে মাঝে যেতাম পরিচয় পত্রিকার অফিসে। জায়গাটা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে খুবই কাছে কফি হাউস থেকেও। ঐখানেই একদিন আলাপ হয়ে গেল হালদার মশায়ের সঙ্গে। তবে তঁার কাছাকাছি যাওয়া খুব সহজ ছিল না। বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ধেবেলা শ ভাষা শেখার ক্লাশেযেতুম। সেখানে একটা আশর্চ্য ল াভ হয়েগেল। অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সেখানে ধ্বনিবিজ্ঞান শেখাতেন।সন্ধেবেলা যারা বিদেশী ভাষা শিখতেন তারা সকলেই অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায়ের ক্লাশে আসতেন। অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে খুব সহজেই আলাপ হয়ে গেল। তাঁর বাড়িতে এবং এসেম্বলি অফিসে তাঁর কাছে যাওয়ার অনুমতি পেলুম। এই দুই জায়গাতেই গোপাল হ ালদার মশাই প্রায়ই যেতেন। কারণ তিনিও অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায়ের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিলেন।

এখানে গোপাল হালদার মশায়ের জীবনের বিশেষ একটা পর্বের কথা বলা যেতে পারে। যদিও এই পর্বে তাঁর সঙ্গে আম ার যোগাযোগ থাকার কথাও নয়। সময়টা ত্রিশ সালের কাছাকাছি। শনিবারের চিঠি কাগজের সঙ্গে তখন গোপাল হালদ ার নিকট সম্পর্কিত। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহোদয়ও তখন শনিবারের চিঠি কাগজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ। বোধহয় সেই সূত্রেই কিংবা দাদা রঙ্গীন হালদারের সূত্রে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে গোপাল হালদারের যোগাযোগ হয় এবং ভ াষা বিজ্ঞান চর্চার প্রতি গোপাল হালদার আকৃষ্ট হন। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি ভাষা সাহিত্যের ছাত্র ছিলেন। সুনীতিবাবুর অধীনে পূর্ব বাংলার উপভাষা নিয়ে গবেষণাকরার জন্য তিনি তৈরী হলেন। কিন্তু তিনি তখন গুপ্ত র াজনৈতিক আন্দোলনেও জড়িত। ঠিক এই সময়েই গ্রেপ্তার হয়ে গেলেন তিনি।

কারাদ্ধ শিষ্যের সাহায্যে এগিয়ে গেলেন অধ্যাপক। তাঁকে চিঠি লিখে এবং আরো নানাভাবে উৎসাহিত করলেন। যাতে জেলখানাতে বসেই তাঁর শিষ্য গবেষণাকর্মটি চালিয়ে যেতে পারেন। ব্যাপারটা তখনকার পরিস্থিতিতে অসাধারণ ছিল। জেল কর্তৃপক্ষ নানাভাবে যাচাই করে অনেক টালবাহানার পর এ ব্যাপারে অনুমতি দিয়েছিল। অবিলম্বে গোপাল হালদ ার জেলখানায় বসেই নোয়াখালি জেলার বাংলা উপভাষা সম্বন্ধেদুটি অভিসন্দর্ভ রচনা করলেন। একটি ধ্বনি সম্পর্কীয় আর একটি ব্যাকরণ সম্পর্কীয়। তিনি জেলখানায় থাকতে তাকতেই তাঁর অধ্যাপকের তত্ত্বাবধানে এই দুই অভিসন্দর্ভ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জার্নালে ছাপা হয়ে গেল এবং গোপাল হালদার ভাষাবিজ্ঞানী হিসেবে দেশে এবং বিদেশে স্ব ীকৃতি পেয়ে গেলেন। তাঁর অভিসন্দর্ভ দুটি স্যার জর্জ আব্রাহাম গ্রীয়ারসনেরও নজরে পড়ল। অভিসন্দর্ভে গ্রীয়ারসনের লিঙ্গুউস্টিক সার্ভে অফ ইণ্ডিয়ার কয়েকটি তথ্যের ত্রুটি প্রদর্শন করা হয়েছিল। গ্রীয়ারসন সে সমালোচনা মেনে নিয়েছিলেন। তখনকার দিনে বিষয়টির গুত্ব কম ছিল না।

এরপর জেলখানাতেই গোপাল হালদার আর একটি বড়ো কাজে হাত দিয়েছিলেন। কাজটি ছিল -- পূর্ব বঙ্গের বিভিন্ন উপভাষার তুলনামূলক বিচার বিবেচনা। ইংরেজের জেলখানা তখন বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলার স্বাধীনতা সংগ্রামীতে একেবারে ভর্তি। তাঁদের কাছ থেকে ভিন্ন ভিন্ন জেলার বাংলা উপভাষার নমুনা সংগ্রহ করে তিনি আলোচনা করলেন। জেলাখানাতেই কাজটি মোটামুটি দাঁড় করানো হয়ে গেল। পরে এটি তিনি সম্পূর্ণ করেছিলেন কিন্তু এই কাজটি দীর্ঘদিন অপ্রকাশিত ছিল। এক সময় প্রস্তাব হয়েছিল, যাতে মস্কোর প্রাচ্যবিদ্যা ইনস্টিট্যুট থেকে এই কাজটি প্রকাশিত হয়। কিন্তু তা হয়ে ওঠেনি নানা কারণে। তো, এইসব কারণে অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে গোপাল হালদারের ঘনিষ্ঠ স ম্পর্ক ছিল। ১৯৫৭ সালে বাংলায় এম. এ. পাশ করার পর আমিও পূর্ব বাংলার উপভাষা নিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা করার অনুমতি পেয়ে গেলুম। কিন্তু তখন অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স ম্পর্ক ক্ষীণ হয়ে গেছে। ফলে ড. সুকুমার সেন আমার গাইড হলেন। কিন্তু সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কাছে আমার যাত ায়াত আরো বাড়ল। এই সময়ে গোপাল হালদারের আর একটু কাছে যাওয়ার সুযোগ হল। তখন আমি শভাষা নিয়েও

একটু লেখালেখি শু করেছি। ন্যাশনাল বুক এজেন্সি শভাষা থেকে আমার অনুবাদ করা তিনখানা বই প্রকাশ করেছে। এই সময় গোপাল হালদার মহোদয়ের স্ত্রী মেদিনীপুরের মেয়ে ড. অণা হালদার রাশিয়ায় গেলেন। ঐ সময়েই অধ্যপক নীরেন্দ্রনাথ রায়ও রাশিয়ায় ছিলেন।

গোপাল হালদার মহোদয়ও শ ভাষা এবং সাহিত্য সর্ম্পকে আগ্রহী হয়ে পড়েন এবং আমার হঙ্গে হঠাৎ কোথাও দেখা হয়ে গেল শ সাহিত্য সম্বন্ধে একটু একটু আলাপ - আলোচনাও করতেন। শ ভাষা সাহিত্যসম্পন্ধে তাঁর ঐ সময়ের ঔৎসুক্য পরে বিশেষভাবে ফলবতী হয়েছিল। কিছুদিন পরে তিনিও রাশিয়ায় গেলেন এবং সেখানে প্রায় ছ-মাস থাকার সুযোগ পেলেন।

তখন তিনি শ সাহিত্য পড়বার অনেক সুযোগ পেয়েছিলেন কিন্তু শ ভাষাটি শেখবার সুযোগ পেলেন না। ফলে, ইংরেজি অনুবাদের উপরই তাঁকে নির্ভর করতে হয়েছিল। অধ্যাপক নীরেন রায় গিয়েছিলেন অনুবাদক হিসেবে, পরে সমর সেন এবং মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়ও একই উদ্দেশ্যে মস্কো যান। কিন্তু সকলেই শ গ্রন্থাদির ইংরেজি অনুবাদের বাংলা করতেন। যাই হোক, গোপাল হালদার মহোদয় দেশে ফিরে লিখলেন--- শ সাহিত্যের রূপরেখা। প্রথমে লিখেছিলেন ২ খণ্ডে বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা, পরে লিখলেন ইংরেজি সাহিত্যের রূপরেখা। আর শেষে লিখলেন শ সাহিত্যের রূপরেখা। কিছু সংখ্যক শ ব্যক্তিনাম এবং গ্রন্থনামের বাংলা বানান সম্বন্ধে তাঁকে পরামর্শ দেওয়ার সুযোগ হয়েছিল। তিনি খুশি হয়ে আম ার নাম লিখে পরে বইটি আমাকে উপহার দিয়েছিলেন।

।। তিন ।।

আর একটা বিষয়ের কথা এইখানে বলে নেওয়া যেতে পারে। এ বিষয়ের সঙ্গেও আমার কোনো ব্যক্তিগত যোগ ছিল না। বিষয়টি পত্র - পত্রিকা এবং নানাজনের মুখ থেকে জানা। তবে এ সম্বন্ধে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, গোপাল হালদার এবং সত্যপ্রিয় রায় মহোদয়ের কাছ থেকেও কোনো বিষয় সম্বন্ধে শুনেছি। বিষয়টি হলো পশ্চিমবঙ্গের লেজিসলেটিভ কাউন্সিল সম্বন্ধীয়।

সেই সময় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন ড. বিধানচন্দ্র রায়। তিনি অনেক ভালো কাজ করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তিনি পশ্চিমবঙ্গ এবং বিহার মিলিয়ে একটি রাজ্যে পরিণত করার প্রস্তাব মেনে নিয়েছিলেন। এতে সেই সময় পশ্চিমবাংলায় ব্য াপক অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছিল। ছাত্ররা এবং বুদ্ধিজীবীরা, শিক্ষক - অধ্যাপকমণ্ডলী এই প্রস্তাবের বিদ্ধে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। এই আন্দোলনের সামনের সারিতে ছিলেন গোপাল হালদার। সেই সময় পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের বিধানসভ ারও একটি উচচতর সভা ছিল। তাকে বলা হত বিধান পরিষদ। বিধানসভারগৃহীত প্রস্তাব আবার সেই পরিষদে আলো চিত হত। এই পরিষদের সভ্য হতেন রাজ্যের জ্ঞানী, গুণী, শিক্ষিত মানুষেরা।তারা হতেন নানা এলিট প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি। যেন রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েটদের প্রতিনিধিরা যেতেন। তো, এই সময় বিধান পরিষদের সভাপতি করা হয়েছিল সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়কে। এদিকে গোপাল হালদার ছিলেন পরিষদের অন্যতম বামপন্থী সদস্য। সেই হিসেবে গোপ াল হালদার মহোদয় বিধান পরিষদে বঙ্গ-বিহার একীকরণ প্রস্তাবের তীব্র বিরোধীতা করেন। আন্দোলন যখন সরকারের আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে তখন সরকার পক্ষ বাধ্য হয়ে প্রস্তাবটি প্রত্যাহার করে নেয়। তার ফলে প্রস্তাবের বিরোধীরা বিপুলভাবে সম্বর্ধিত হন এবং বিশেষ করে গোপাল হালদার মহোদয়কে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। বিধান পরিষদের সদস্য হিসেবে গোপাল হাদদার মহোদয়ের আর একটি ভূমিকার কথা স্মরণযোগ্য। সেটা সরকারি কাজে পশ্চিমবঙ্গে বাংলা ভাষ ার ব্যবহার বিষয়ক।

বাংলা ভাষায় উচচশিক্ষা দানের ব্যবস্থা করা হোক এবং সমস্ত সরকারি কাজে বাংলা ভাষা ব্যবহার করা হোক-- এই দা বিতে রবীন্দ্রনাথের সময় থেকেই বুদ্ধিজীবীদের একাংশ সরব ছিলেন। তো, যখন সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহোদয় বিধান পরিষদের সভাপতি এবং গোপাল হালদার, সত্যপ্রিয় রায় প্রমুখ সদস্য তখন আইনী স্তরে বিষয়টি নিয়ে আন্দোলন শু হল। গোপাল হালদার এবং অন্যান্য বামপন্থি বুদ্ধিজীবীরা মিলে বেসরকারী উদ্যোগে ব্যাপারটি নিয়ে সরব হয়েছিলেন। কংগ্রেস সরকার শেষ পর্যন্ত এই ব্যাপারটিও মেনে নেন। এই আন্দোলনেও হালদার মহোদয়ের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়েছিল।

পরিচয় পত্রিকার সম্পাদক হিসেবেও তিনি বিশেষ ভাবে স্মরণীয়। পরিচয় পত্রিকার আর্থিক অবস্থা কোনোদিনই ভালো

ছিল না। তথাপি প্রতিষ্ঠাতা কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত এই পত্রিকার পরিচালনভার ছেড়ে দেওয়ার পর বিশেষ করে বামপন্থী, প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীদের একাংশ এককালীন অর্থনিয়োগ করে একটি ট্রাস্ট জাতীয় সংগঠন তৈরী করে দেন। অবশ্য আজকের হিসেবে সেই অর্থের পরিমাণ খুব বেশি ছিল না। কিন্তু ব্যাপারটির মধ্যেবিরাট একটা নৈতিক এবং আদর্শবাদী সমর্থন ছিল। পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী বুদ্ধিচর্চার ক্ষেত্রে পরিচয় পত্রিকার ভূমিকার কথা অস্বীকার করে নি। পরিচয় পত্রিকার এই ভূমিকা গড়ে তোলার পিছনে গোপাল হালদার মহোদয়ের অবদানও কম নয়। এই পত্রিকায় তাঁর বহু রচনা ছাপা হয়েছে এবং এই পত্রিকায় প্রকাশিত বহু রচনাতেই সম্পাদক হিসেবে তাঁর হাত পড়েছে।

।। চার ।।

এবার আবার ব্যক্তিগত প্রসঙ্গে ফিরে আসা যেতে পারে। এ রচনা গোপাল হালদার মহোদয়ের কর্মজীবনের, রাজনৈতিক জীবনের বা সাহিত্যিকজীবনের পরিচয় দেওয়ার উদ্দেশ্যে লেখা হচ্ছে না। কারণ সে কাজ আরো উপযুক্ত কেউ করবেন। এ লেখা, আমি আমার সব রকমের সীমাবদ্ধতায়, তাঁকে যেমন জেনেছিলাম তারই স্মৃতিচারণামাত্র। রাজনৈতিক মহলে এবং বামপন্থী বুদ্ধিজীবী মহলে তিনি এখন প্রায় ধূসর স্মৃতি। যাঁরা তাঁর ঘনিষ্ঠ ছিলেন তাঁরাঅনেকেই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন। অনেকে বর্তমানে অতিবৃদ্ধ। আমার প্রজন্মের যাঁরা তাঁকে দেখেছেন বা জানতেন তাঁরাও বার্ধর্কের দ্বারপ্রান্তে উপনীত। তাই অনুদ্ধ হলে, কিছু অন্তত না লিখে একেবারে নীরব থাকাও অনুচিত। অল্প একটু সাক্ষ্য থাক অন্তত।

আটান্ন সালে বাংলার অধ্যাপক হয়ে মেদিনীপুর কলেজে পড়াতে এলুম। তারপর থেকে মেদিনীপুরই ক্রমশ আমার স্থায়ী বাসস্থান হয়ে গেল। কলকাতায় যাওয়া কমে গেল। গেলেও আগের মত ঘুরে বেড়ানো, বন্ধুদের সঙ্গেআড্ডা দেওয়ার আর উপায় রইল না। তাছাড়া তখনকার দিনে রেল যোগাযোগও এত ভালো ছিল না। বহু সময় বাজে খরচ হত রেল যাত্রায়। তাছাড়া কর্মস্থলের বাইরে চলে যাওয়া নিয়ে কর্তৃপক্ষের বিধি নিষেধও ছিল। ফলে মেদিনীপুরের সঙ্গে নানাভাবে আমার সম্পর্ক গড়ে উঠল আর ভাষাবিজ্ঞানের চর্চায় মনোযোগ বাড়ল। পরিচয়ে আমার বেশ কিছু লেখা ছাপা হয়েছিল নানা সময়ে। কেবল একটি লেখা প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল। লেখাটি ছিল বাংলা লিপি সংস্কার বিষয়ক। এই লেখাটিতে আমার প্রস্তাব ছিল যে রোমান লিপির মত বাংলাও যেন পাশাপাশি লেখা হয়।

প্রস্তাবটি কেবল ভাষাবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকেই তোলা হয়েছিল। তাতে সমসাময়িক সামাজিক পরিস্থিতি এবং বাস্তব প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি বিবেচিত হয়নি। লেখাটি প্রকাশিত হলো নিশ্চয়ই প্রতিবাদ উঠত এবং হয়তো তণ লেখকটি নিন্দিত হতেন। জানিনা এই জন্যেই কিনা, গোপাল হালদার মহোদয় তাঁর মন্তব্য সহ লেখাটি ফেরৎ দিলেন। সেই সময় এতে প্রচণ্ড আহত বোধ করেছিলুম। কিন্তু গোপাল হালদার মহোদয়ের সৌজন্য ও ভদ্রতা ছিল প্রাতীত। তার উপর তিনি দেখা হলেই আমাদের মতো কমবয়েসীদের আপনি - সম্বোধন করতেন। তাঁর স্থান এত উপরে ছিল যে তাঁর উপর বিরূপ হওয়া আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না।

বাংলা উপভাষা নিয়ে যখন গবেষণা শু করলুম তখন অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহোদয়ের বাড়িতে গোপাল হালদারের সঙ্গে বেশ কয়েকবার দেখা হয়েছে। অগ্রজ গবেষক হিসেবে তিনি কিন্তু কখনো আমার কাজ সম্বন্ধে বিশেষ কোনো ঔৎসুক্য দেখান নি। আমাকে এ সম্বন্ধেকোনো প্রশ্নও করতেন না কিংবা কখনোকোনো উৎসাহ বাক্যও বলেন নি। মনে হয় এর দুটো কারণ থাকা সম্ভব। হয়তো আমার যোগ্যতা সম্বন্ধেতাঁর আস্থা ছিল না কিংবা সেই সময় ভাষাবিজ্ঞান সম্বন্ধে তিনি আর আগ্রহী ছিলেন না, কিংবা হয়তো দুটোই। তবে সেসময় এ ব্যাপারটা নিয়ে আমি মাথা ঘামতাম না। কারণ গোপাল হালদার মহোদয়ের সুভদ্র সৌজন্যই সব সময় বড়ো হয়ে উঠত।

মেদিনীপুর শহরের এক প্রাচীন পরিবারের মেয়ে ড. অণা সিংহকে বিয়ে করার সুবাদে গোপাল হালদার মেদিনীপুর শহরে এসেছেন অনেক অনেকবার। নতুন সাহিত্য পত্রিকা-র সম্পাদক অনিল সিংহ কেবল তাঁর শ্যালক ছিলেন না, বন্ধুও ছিলেন। অনিল সিংহ অকালে প্রয়াত হন-- বলা যায়। তার পরেও দু একবার তিনি মেদিনীপুরে এসেছেন, দুচার দিন করে থেকেছেন। তিনি মেদিনীপুরে এসেছেন খবর পেলেই তাঁর সঙ্গে গিয়ে দেখা করতুম। কখনো নিজেই খবর পাঠাতেন। এসব সময়ে কখনো তাঁর সঙ্গে মতানৈক্য হয়নি। নানা গল্পে, আলাপ - আলোচনায় কি করে যে সময় কেটে যেত টেরও পেতাম না।

আমহার্স্ট স্ট্রীট আর বিবেকানন্দ রোডের মোড়ের কাছে একটি দোতালা বাড়িতে এক সময় গোপাল হালদার মহোদয় বাস

করতেন। এখন ঠিক মনে পড়ে না কেন সেখানে তাঁর কাছে গিয়েছিলুম। বোধহয় কোনো সভার আমন্ত্রণ পত্র দিতে কিংবা ঐ রকম আর কিছু। তারপর অবশ্য একসময় ত্রিস্টোফার রোডের আবাসনে দোতলায় একটা ছিল স্থায়ী ঠিকানা। তবে ঐ সময় তিনি মাঝে মাঝেই স্ত্রীর কাছে পাটনায় চলে যেতেন। পাটনায় থাকতেন তাঁর দাদা অধ্যাপক রঙ্গীন হালদার। তিনি ছিলেন বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানী। আর পাটনাতেই ড. অণা হালদারও অধ্যাপনা করতেন। কাজেই সুযোগ পেলেই যে তিনি সেখানে গিয়ে থাকবেন এতে আর আশর্চ্য কি ? তবে কলকাতাতেই তাঁকে বেশি সময় থাকতে হত। তখন ত্রিস্টোফার রে াডের ফ্ল্যাটে অনেকেই যেতেন। আমিও কয়েকবার গিয়েছি। দেখেছি দেয়ালে ঝুলছে যামিনী রায়ের আঁকা একটা বিখ্যাত ছবি।

আর দু-ঘর ভর্তি ননারকমের বই, পত্র - পত্রিকা। আসবাব সামান্য। ফ্ল্যাটগুলি নেহাৎ কেজো ধরনের ছিল, খুব একটা বড়ো নয়। কীজন্যে তাঁর কাছে গিয়েছিলুম তা স্পষ্ট মনে পড়ে না। বোধহয় নিতান্তই সৌজন্যমূলক কিংবা অন্য কেউ গিয়েছিলেন, আমি হয়তো নিতান্ত সঙ্গী মাত্র ছিলুম। কিন্তু প্রতিবারই একটা বিশেষ রকমের ভালো লাগা নিয়ে ফিরেছি। কারণ বয়েস এবং অন্য সবদিকে বড়ো হওয়া সত্ত্বেও তিনি ওপর থেকে কথা বলতেন না, যথেষ্ট সম্মান দিয়েই কথা বলতেন। তার ফলে তাঁর সম্বন্ধে আমার মনে যথেষ্ট শ্রদ্ধা এবং সমীহের ভাব ছিল। পূর্ব বাংলার উপভাষা সমূহের তুলন ামূলক আলোচনা বিষয়ক গোপাল হালদারের রচনাটি যেটি তিনি জেলখানায় বসে লিখেছিলেন সেটি অচ্যুতানন্দ সাহা তাঁর পুঁথিপত্র নামক প্রকাশনা সংস্থা থেকে বার করলেন। পুঁথিপত্র রূপনারাণের কূলে নামে গোপাল হালদার মহোদয়ের আত্মজীবনীটিও প্রকাশ করেছিলেন।

অচ্যুতানন্দ সাহা মহোদয়ের পুঁথিপত্রে আমারও যাতায়াত ছিল। তিনি বিশেষ স্নেহ করতেন। পূর্ব বঙ্গের উপভাষা বিষয়ক বইটি প্রকাশিত হলে তিনি আমাকে এককপি উপহার দিয়েছিলেন। বইটি আজও আমার সংগ্রহে আছে। গোপাল হালদ ার মহোদয়ের এই স্মৃতিকথনের মধ্যে দিয়ে তাঁর প্রতি আমার অকৃত্রিম শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে এই লেখা শেষ করছি।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com